

## প্রথম অধ্যায়

# বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম

স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম বাঙালির জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের পর স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাঙালিরা পাকিস্তান রাষ্ট্রের শোষণ, অত্যাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে সংগ্রাম ও আন্দোলন চালিয়ে এসেছিল। এর মধ্যে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন, সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন অন্যতম। এছাড়া ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা, সাংস্কৃতিক স্বাধিকার আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচন বাঙালির জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। এসব আন্দোলন ও ঘটনার মধ্য দিয়েই পাকিস্তান বিরোধী চেতনা বেগবান হয়েছে, বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়েছে মানুষ। ফলে ১৯৭১ সালে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। এই রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। এ অধ্যায়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলন ও সংগ্রামের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করা হলো।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

১. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের কারণ বর্ণনা করতে পারব ;
২. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ঘটনা বর্ণনা করতে পারব ;
৩. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারব ;
৪. যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে বাঙালির অর্জনসমূহ বর্ণনা করতে পারব ;
৫. ছয় দফা আন্দোলন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব ;
৬. ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারব ;
৭. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ঘটনা ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব ;
৮. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালির নিরঙ্কুশ বিজয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব ;
৯. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বৈষম্য ছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারব।

### পাঠ ১ : রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের পর রাষ্ট্রের নীতি, আদর্শ নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। এ অবস্থাকে বলা যায় সংহতির বা একাত্মতার সংকট। হিন্দু ও মুসলিম দুই পৃথক জাতি, এই দাবি ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে প্রধান যুক্তি। দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা জিন্নাহ নিজে পাকিস্তানের স্বাধীনতার কয়েকদিন পরেই গণপরিষদে বললেন,



কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার

‘মুসলিম-হিন্দু-খ্রিষ্টান-বৌদ্ধ কিংবা পাঞ্জাবি-বাঙালি-সিন্ধি-পাখতুন পরিচয় ভুলে সকলকেই এখন এক পাকিস্তানি হতে হবে।’ কিন্তু সেই পাকিস্তানের ঐক্যসূত্র তৈরি করতে গিয়ে তারা ইসলাম ও উর্দুভাষার উপর জোর দেয় আর অন্যান্য ধর্ম ও ভাষা-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। এমনকি বাংলাভাষার সমৃদ্ধ সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ-মাইকেল-বঙ্কিমের মতো গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিকদের প্রতি তৎকালীন পাকিস্তান সরকার বৈরি অবস্থান গ্রহণ করে।

বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহসহ এদেশের অগ্রণী বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকরা বাংলাভাষা, বাংলা সাহিত্য, বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষায় এগিয়ে আসেন। এ সময়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একটি ভাষণে বলেছিলেন— ‘আমরা হিন্দু বা মুসলিম যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোনো আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারা ও ভাষায় বাঙালিভূত্ব এমন ছাপ দিয়েছেন যে, তা মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো-টি নেই’।

পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর রাষ্ট্রভাষা কী হবে? এ প্রশ্ন দেখা দিলে পূর্ব পাকিস্তানের সচেতন ও শিক্ষিত জনগণ তাদের মায়ের ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার দাবি করে। কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তান সরকার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে ছাত্র-শিক্ষকদের সমাবেশে পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন—‘পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু’। উপস্থিত ছাত্ররা ‘না না না’—ধ্বনিতে এর প্রতিবাদ জানায়। দেশের শিক্ষাবিদ-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী এবং অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে অবস্থান নেন। পাকিস্তান গণপরিষদে বাঙালি সদস্য একান্তরের শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। দুঃখের বিষয় মুসলিম লীগের অনেক বাঙালি সদস্যও এই বিরোধিতায় যোগ দিয়েছিলেন। অথচ বাংলা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া ছিল যুক্তিযুক্ত। পাকিস্তানের তৎকালীন মোট জনসংখ্যা ছিল ৬ কোটি ৯০ লক্ষ। এর মধ্যে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ বাঙালি। বাকি আড়াই কোটি মানুষের মাতৃভাষাও উর্দু ছিল না।

দেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ভাষাকে সংখ্যাগুরু বাঙালির উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী। বাঙালিরা কেবল বাংলা ভাষাকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করে নি, তারা উর্দুর পাশাপাশি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি চেয়েছিল।

মাতৃভাষার অধিকারের জন্যে এদেশে একাধিক উদ্যোগের কথা জানা যায়। এর মধ্যে রাজনীতিবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমন্বয়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদে সক্রিয় ভূমিকায় ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এ কারণে ভাষা আন্দোলনের সময় তাঁকে বার বার কারা বরণ করতে হয়। বঙ্গবন্ধু ছাড়াও ভাষা আন্দোলনে তুরুগদের মধ্যে সক্রিয় ছিলেন কাজী গোলাম মাহবুব, শওকত আলী, গাজীউল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, আব্দুল মতিন প্রমুখ।

১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ভাষার দাবিতে সমগ্র দেশে ধর্মঘট ঢাকা হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ, কাজী গোলাম মাহবুবসহ অধিকাংশ নেতা শ্রেষ্ঠতার হন। এর ধারাবাহিকতার পরবর্তীতে ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত সিন্ডিকেটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কান্না অন্তরীণ ছিলেন। পুলিশের দমন-পীড়নে বহু ছাত্র-ছাত্রী আহত হয়। এতেও ভাষার জন্য আন্দোলন কিস্তি বন্ধ হয় নি। এই ঘটনার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন করা হয়। আন্দোলনের পথ ধরে ১৯৫২ সালে ঢাকার প্রাদেশিক-পরিষদের অধিবেশন বসলে ছাত্ররা গণ-পরিষদ ঘোষণা করে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। দিনটি ছিল ২১শে ফেব্রুয়ারি।

পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী মুকুল আমিনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ সরকার ছাত্রদের বাধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। অর্থাৎ চারজননের বেশি একজোট হয়ে রাস্তায় মিছিল করতে পারবে না। কিন্তু সত্বেয় ছাত্ররা তা মানতে পারেনি। তারা মাতৃভাষার মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় আপোসহীন সাহসী ভূমিকা নিতে প্রস্তুত। ২০শে ফেব্রুয়ারি রাতে সন্ধ্যা করে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভেঙে মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত নেয়।

সেদিন আন্দোলনকারীদের ঠেকাতে পুলিশ অস্ত্র হাতে খাঁপিয়ে পড়েছিল। প্রথমে তারা লাঠি চার্জ করলো ও কঁালানে গ্যাস ছুড়লো। তাতেও দমাতে পারলো না বিক্ষোভকারীদের। মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন আবদুল মতিন ও

গাজীউল হক। এবার গুলি ঢাললো পুলিশ। গুলিতে নিহত হলেন রফিক উদ্দিন, আব্দুল জব্বার এবং আবুল বরকত। আহতের সংখ্যা ছিল অনেক। তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে আবদুল সালাম চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। ২২শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতার মিছিলে শফিউর রহমানসহ নয় বছরের কিশোর ওলিউল্লাহও পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিল। এছাড়া নাম না জানা আরো অনেকে ২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারিতে নিহত হয়েছিল। তাঁরা সবাই ভাষা শহিদ।



শহিদ রফিক



শহিদ জব্বার



শহিদ বরকত



শহিদ সালাম



শহিদ শফিউর

ভাষা আন্দোলনে শহিদেরা

যেখানে পুলিশের গুলিতে তাঁরা শহিদ হয়েছিলেন সেই স্থানে ২৩শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা তৈরি করে একটি শহিদ মিনার। ১৯৬৩ সালে এই অস্থায়ী মিনারটির স্থলে বড় করে শহিদ মিনার তৈরি করা হয়। এটিই ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে গড়া কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার।

### ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য

বাঙালি বুকের রক্ত দিয়ে মাতৃভাষার সম্মান রক্ষা করতে পেরেছিল। শেষ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার আইনসভা বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে। অবশেষে বাঙালি জাতির বিজয় অর্জিত হয়। বাংলা এবং উর্দু দুই ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে।

সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মাধ্যমে মাতৃভাষার স্বীকৃতির ন্যায় দাবি আদায়ে সফল হয়ে বাঙালির মনে জাতীয় চেতনা জোরদার হয়। বাংলাভাষা, বাংলা সাহিত্য এবং বাঙালির হাজার বছরের সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব করার সাথে সাথে আত্মবিশ্বাস ফিরে পায় বাঙালিরা।

ভাষার জন্য বাঙালির এই মহান আন্দোলনকে শ্রদ্ধা জানায় বিশ্ববাসী। ১৯৯৯ সালে আমাদের ভাষা আন্দোলন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে। কানাডায় বসবাসরত মুজিব বাঙালি রফিকুল ইসলাম ও আব্দুস সালামের প্রাথমিক উদ্যোগে এবং তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার প্রধান শেখ হাসিনার জোরালো তৎপরতার কারণে সে বছর ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। তাই এখন প্রতিবছর ২১শে ফেব্রুয়ারি দিনটিতে পৃথিবীর সকল জাতি নিজ নিজ মাতৃভাষাকে বিশেষ সম্মান জানিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করে। সেই সাথে স্মরণ করে ভাষার জন্য বাঙালির আত্মত্যাগের কথা।

কাজ- ১ : ভাষা আন্দোলনে শহিদদের ছবিসহ পরিচিতি দেখ।

### পাঠ ২ : বুজ্জফন্ট

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই শাসকদের ষড়যন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মনে ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। আত্মরক্ষা ও আত্মবিকাশের প্রার্থে নানা মতের মানুষ এক হতে থাকে। ক্ষমতাসীন দল মুসলিম লীগ যেন ষড়যন্ত্র আর শোষণের প্রতীক হয়ে উঠে। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে পরাজিত করে বাঙালি অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এদেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দ মিলে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯৫৪ সালে একটি জোট গঠন করেন। এ জোটই বুজ্জফন্ট নামে পরিচিত। এ নির্বাচনে বুজ্জফন্টে যোগ দেয় আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম ও গণতন্ত্রী দল। বুজ্জফন্ট ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও পূর্ব বাংলার মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।



হোসেন শহীদ চৌধুরী



শেখ মুজিবুর রহমান



মওলানা আবদুল কলাম আজাদ

### মুক্তফ্রন্ট গঠন ও ২১ দফা কর্মসূচি

১৯৫৪ সালের নির্বাচন পাকিস্তানের দুই অংশের পার্লামেন্ট বা সংসদ নিয়ে গঠিত জাতীয় পরিষদের কোন নির্বাচন ছিল না। এটি ছিল শুধু পূর্ব বাংলার আইন পরিষদের নির্বাচন।

বাঙালি জাতি, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ নেতৃত্বের কার্যকলাপ ও পাকিস্তানি শোষণ প্রতিরোধে এ নির্বাচন ছিল একটি মাইলফলক। কমতাসীন মুসলিম লীগসহ মোট ১৬টি দল এ নির্বাচনে অংশ নেয়। মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় মুক্তফ্রন্ট ও মুসলিম লীগের মধ্যে। মুক্তফ্রন্ট 'নৌকা' প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করে। মুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বে ছিলেন তৎকালীন বাংলার তিন প্রবীণ নেতা— শেখ বাহালা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। এ সময়ে তরুণদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ও জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা হয়ে উঠেন।



১৯৫৪ সালের মুক্তফ্রন্ট মহাসভার  
সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করছেন  
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মুক্তফ্রন্ট জনগণের সামনে তাদের ২১ দফা কর্মসূচি প্রকাশ করে। এতে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি, জমিদারি প্রথা বাতিল, পাটশিল্প জাতীয়করণ, সমবায়ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা, মাতৃভাষার মাধ্যমে অবৈজ্ঞানিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাদান ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হয়। এছাড়া সমস্ত অন্যায় আইনকানুন বাতিল, ৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের শহিদ স্মরণে শহিদ মিনার নির্মাণ, ২১শে ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটি ঘোষণা এবং পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের কথাও বলা হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নের জন্যে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার দাবিও এতে ছিল।

### নির্বাচনের ফলাফল

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য আলাদা আসন ছিল, আলাদা ভোট হয়। পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদ নির্বাচনে ৩০৯টি আসনের মধ্যে মুক্তফ্রন্ট ২৩৬টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। অপরদিকে কমতাসীন মুসলিম লীগের চরম বিশর্ষণ ঘটে—দলটি মাত্র ৯টি আসন পায়। বাকি আসনে স্বতন্ত্ররাষ্ট্রসহ অন্যান্য দল বিজয়ী হয়। মুক্তফ্রন্টের এ বিজয়কে দেশ-বিদেশের পত্রপত্রিকা 'ব্যালট বিপ্লব' বলে আখ্যায়িত করে।

এ নির্বাচন ছিল পূর্ব-বাংলার প্রান্তবঙ্গদেশের ভোটে প্রথম সর্বজনীন নির্বাচন। বাঙালি জাতি নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য উজ্জীবিত হয়ে মুক্তফ্রন্টের নৌকা প্রতীকে ভোট দেয়। শুধু ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষকে যে ধোঁকা দেয়া যায় না মুসলিম লীগের ফলাফল বিশর্ষণে তা প্রমাণিত হয়। ভাষা ও সংস্কৃতি বিরোধী অবস্থান

নিয়ে কঠোর দমননীতি ও স্বৈরশাসন চালিয়ে কোনো সরকার যে টিকে থাকতে পারে না তাও প্রমাণিত হয়। বাঙালির নতুন এ জাতীয়তাবাদী চেতনা পরবর্তীকালে সকল আন্দোলন ও নির্বাচনে প্রেরণা জুগিয়েছে। অন্যদিকে মুসলিম লীগ একটি গণবিরোধী দল হিসেবে পরিচিত হয়। ১৯৫৭ সালের মধ্যে দলটি বহুধা বিভক্ত হয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে বিদায় নেয়।

#### মুসলিম লীগের পরাজয় ও যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের কারণ

স্বাধীনতার পর থেকে মুসলিম লীগের ভূমিকা বাঙালিকে ক্ষুব্ধ করেছিল। আর ভাষা আন্দোলনের বিজয়ের ফলে দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্যে তাদের আকাঙ্ক্ষা বেগবান হয়ে উঠে। যুক্তফ্রন্টে বিভিন্ন দল ও মতের মানুষ একত্রিত হয়েছিল, এটি যুক্তফ্রন্টের সহজ বিজয়ের অন্যতম কারণ। এ জোটের কর্মসূচিতে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। বাংলাভাষার মর্যাদা দান, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্রসহ সকল শ্রেণির মানুষের কথা এতে ছিল। ২১ দফা কর্মসূচিও তাদের সহজ বিজয়ের আরেকটি কারণ। যুক্তফ্রন্টে প্রবীণ ও তরুণ নেতা কর্মীদের সমন্বয় ঘটে। পাশাপাশি তরুণদের প্রচার অভিযান ছিল চোখে পড়ার মতো। অন্যদিকে মুসলিম লীগের কর্মসূচি ছিল অস্পষ্ট ও গৌজামিলে ভরা। গণবিচ্ছিন্ন নেতা-কর্মীরা যুক্তফ্রন্টের কর্মীদের প্রচারাভিযানের জোয়ারে ভেসে যায়। মুসলিম লীগের দুঃশাসন, দ্রব্যমূল্যে উর্ধ্বগতি, শোষণ, দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, দুর্নীতি, পাকিস্তানের দুই অংশের বৈষম্য ইত্যাদি ছিল মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ।

কাজ- ১ : যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার মূল দাবিগুলো লেখ।

কাজ- ২ : পৃথক পৃথক ছকে মুসলিম লীগের পরাজয় ও যুক্তফ্রন্টের জয়ের কারণগুলো তালিকা তৈরি কর।

#### বাঙালির অর্জন

স্বাধীনতার পর থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র কখনও থেমে থাকেনি। তা বরাবর অব্যাহত ছিল। দুই মাসের মাথায় বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেওয়া হয়। এরপরে পাকিস্তানের সংবিধান অনুযায়ী বেসামরিক সরকার গঠন করা হলেও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি দেখিয়ে প্রেসিডেন্ট ইক্কান্দার মির্জা ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর দেশে সামরিক আইন জারি করেন। কিছুদিন পর জেনারেল আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট ইক্কান্দার মির্জাকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে নিজেকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেন। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ছিল এবং তখন অনেক রাজনৈতিক নেতাকে কারাগারে বন্দি করা হয়। এই রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণের জন্য বাঙালি ছাত্ররা এগিয়ে আসেন। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান একটি সংবিধান রচনা করে। এই সংবিধানে বাঙালির গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা ক্ষুণ্ণ হওয়ায় ছাত্ররা আন্দোলন গড়ে তোলে। তবে ছাত্রদের আন্দোলন অনেক বেশি জোরালো রূপ পায় সরকার শিক্ষানীতি ঘোষণা করলে। শরিফ কমিশন নামে



পরিচিত এই শিক্ষানীতিতে বাংলার বদলে পাকিস্তানের দুই অংশের জন্য উর্দুভাষা চালু করা, অবৈতনিক শিক্ষা বাতিল করা এবং উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ কমিয়ে দেয়ার বিধান যোগ করা হয়েছিল। ছাত্রদের তীব্র আন্দোলনের ফলে শেষ পর্যন্ত সরকার শরিক কমিশন প্রণীত শিক্ষানীতি বাতিল করতে বাধ্য হয়।

### পাঠ- ৩ : ছয় দফা আন্দোলন

১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব-পাকিস্তানে বাঙালির সব ধরনের অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এই ছয় দফা ছিল মূলত স্বায়ত্তশাসনের দাবি। অর্থাৎ পাকিস্তানের সাথে যুক্ত থেকেই পূর্ব-পাকিস্তানের শাসনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা থাকবে পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের হাতে।



ছয় দফার দাবিতে আয়োজিত জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

### ছয় দফা কর্মসূচি

১. ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রত্যয়ের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করে পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার যুক্তরাষ্ট্র রূপে গড়ে তুলে হবে। তাতে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থাকবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটে অনুষ্ঠিত হবে। আইন সভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকবে।
২. ফেডারেল (কেন্দ্রীয়) সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় বিষয় দুটি থাকবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় প্রদেশের হাতে থাকবে।
৩. পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের জন্য দুটি সম্পূর্ণ পৃথক অঞ্চল সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা প্রচলন করতে হবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে মুদ্রা কেন্দ্রের প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুটি স্বতন্ত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকবে। অথবা দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম-পাকিস্তানে পাচার হতে পারবে না।
৪. সকল প্রকার কর ও খাজনা ধার্য এবং আদায়ের ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকবে। আঞ্চলিক সরকারের আদায়কৃত খাজনার নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে জমা হয়ে যাবে।
৫. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখতে হবে। এবং দুই অঞ্চলের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা যার যার এখতিয়ারে থাকবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য উভয় অংশ সমান অথবা নির্ধারিত আনুশাঙ্গিক হারে বৈদেশিক মুদ্রা প্রদান করবে। আঞ্চলিক সরকারই বিদেশের সাথে বাণিজ্য চুক্তি ও আমদানি-রপ্তানি করার অধিকার রাখবে।
৬. পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য আলাদা একটি আধা সামরিক বাহিনী গঠন করতে হবে।

### ছয় দফা দাবির প্রতিক্রিয়া

ছয় দফা দাবি দেখে শঙ্কিত হয়ে যান সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খান। কারণ স্বায়ত্তশাসন পেয়ে গেলে পূর্ব-পাকিস্তানে তাদের শোষণ বন্ধ হয়ে যাবে। তাছাড়া একসময় অঞ্চলটি স্বাধীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও তারা করতো। এর ফলে কমে যাবে তাদের বৈদেশিক মুদ্রার ভাগ। কারণ পূর্ব-পাকিস্তানে উৎপাদিত পাট বিক্রির টাকাই ছিল পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস। কিন্তু এই টাকা পূর্ব-পাকিস্তানের উন্নতিতে ব্যয় না করে ব্যয় করা হতো পশ্চিম-পাকিস্তানের সামরিক ও বেসামরিক ক্ষেত্রে। বড় বড় চাকরিতে বাঙালিকে খুব কমই সুযোগ দেওয়া হতো। কিন্তু স্বায়ত্তশাসন পেয়ে গেলে পশ্চিম-পাকিস্তানিদের একচেটিয়া সুবিধা পাওয়া সম্ভব হবে না। তাই আবার শুরু হয় ষড়যন্ত্র। এই সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে সরকার প্রদেশের নানা জেলায় মামলা দিতে থাকে। আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়। এভাবে চরম হয়রানির শিকার হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দিন আহমদসহ আওয়ামী লীগের নেতারা। কিন্তু বিপুল জনসমর্থন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দৃঢ়তার ফলে কিছুতেই আন্দোলন দমানো যায় নি।

কাজ ১ : সামরিক শাসন-বিরোধী আন্দোলনের সূচনা ব্যাখ্যা কর।

কাজ ২ : ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলনের কয়েকটি কারণ উল্লেখ কর।

### পাঠ ৪ : ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা (রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য)

আইয়ুব-মোনায়েম চক্র ১৯৬৮ সালে পূর্ব-পাকিস্তানের কয়েকজন সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে পাকিস্তানের স্বার্থ বিরোধী এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগ আনে। প্রকৃতপক্ষে ছয় দফা আন্দোলনকে নস্যাৎ করাই ছিল এ মামলার মুখ্য উদ্দেশ্য। পাকিস্তানের সামরিক সরকার এটিকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নাম দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ মোট ৩৫ জনকে আসামি করে মামলা করে। মামলায় বলা হয় আসামিরা ভারতের যোগসাজশে পূর্ব-পাকিস্তানকে পাকিস্তান রাষ্ট্র হতে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করেছে। সরকারের উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গবন্ধুসহ ৩৫ জনকে দেশের শত্রু হিসেবে প্রমাণ করে চরম শাস্তি দিয়ে বাঙালির ছয় দফা ও স্বাধিকার আন্দোলন চিরদিনের মতো স্তব্ধ করে দেওয়া। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছাত্র-জনতার তীব্র আন্দোলনের মুখে সামরিক সরকার মামলাটি প্রত্যাহার করে সকল বন্দিকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

### এগার দফা আন্দোলন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ছয় দফার পাশাপাশি নতুন এগার দফা আন্দোলন নিয়ে মাঠে নামে। শুরু হয়ে যায় ব্যাপক গণআন্দোলন। এগার দফা কর্মসূচিতে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন, পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, ব্যাংক, বিমা, বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ, কৃষকের খাজনা ও করের হার হ্রাস, সকল রাজবন্দির মুক্তি ও রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারসহ বিভিন্ন দাবির পক্ষে ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করে।



### পাঠ ৫ : উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

জেনারেল আইয়ুব খানের পতনের লক্ষ্যে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারিতে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি সর্বদলীয় ‘ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ’ গঠন করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগার মফা আওয়ামী লীগের ছয় মফা সম্মিলিত দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। সরকার এই আন্দোলনকে দমন করার জন্য পুলিশ নির্ধাতন শুরু করে। ১৯৬৯ সালের ২০শে জানুয়ারি ঢাকায় ছাত্র-জনতার মিছিলে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র আসাদুজ্জামান (আসাদ) নিহত হয়। আসাদ নিহত হওয়ার পর এই আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। ১৯৬৯ এর ১৫ই ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে ঢাকার কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে বন্দি অবস্থায় গুলি করে হত্যা করা হয়। ১৮ই ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানি সৈন্যরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহাফে নির্মমভাবে হত্যা করে। তিনি বিক্ষোভকারী ছাত্রদেরকে শান্ত করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এইসব খবরে সারা দেশে বিক্ষোভের আন্দন ফুলে ওঠে। সাময়িক সরকার ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে রাজবন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়ার ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়। আন্দোলনের তীব্রতার স্রীত হয়ে কমতার টিকে থাকার কোনো উপায় বুঁজে না শেয়ে ২৫শে মার্চ ১৯৬৯ সালে জেনারেল আইয়ুব খান তার সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান-এর হাতে কমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। বাংলার ছাত্র-জনতা এভাবেই তাদের আন্দোলনে সফলতা লাভ করে।



শহিদ আসাদ



শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক



শহিদ ড. শামসুজ্জোহা

### পাঠ- ৬ : ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ইয়াহিয়া খানের হাতে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব দিয়ে পদত্যাগ করেন। কমতা গ্রহণ করেই ইয়াহিয়া খান বাঙালিকে শান্ত করার লক্ষ্যে ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচন দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা ছিল ৩১৩টি। এর মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল ফরমা নং ২, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়-৭ম

১৬৯টি এবং বাকি আসন ছিল পশ্চিম-পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ। জাতীয় পরিষদে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় আওয়ামী লীগ ও পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) মধ্যে।

জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পায় ১৬৭টি আসন এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টি লাভ করে ৮৮টি আসন। উল্লেখ করা যেতে পারে আওয়ামী লীগ পূর্ব-পাকিস্তানে এবং পিপিপি পশ্চিম-পাকিস্তানে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে। এরপর ১৯৭০ সালের ১৭ই ডিসেম্বর পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে ৩১০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ লাভ করে ২৯৮টি এবং বাকি আসন পায় স্বতন্ত্র প্রার্থী ও অন্যান্য দল।

### নির্বাচনের স্তরস্বত্ব

১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে আরও বেগবান করে। যুক্ত পাকিস্তানের দুই অঞ্চলে দুইটি প্রধান দলের প্রাধান্য এটাই প্রমাণ করে যে বাঙালি একটি পৃথক জাতি। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে বাঙালি জাতি ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির দিক থেকে যে স্বাভাবিক দাবি করে আসছিল এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ে যেন তা স্বীকৃতি পায়। বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবি যে সঠিক ছিল তাও প্রমাণিত হয়। এ নির্বাচনে বাঙালি জাতি পশ্চিম-পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীকে বিদায় জানিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে তাদের মুক্তিদাতা হিসেবে গ্রহণ করে।



১৯৭০ সালের নির্বাচনী প্রচারণায় বঙ্গবন্ধু

কাজ-১ : ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল লেখ।

### পাঠ- ৭ ও ৮ : পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হওয়ার পর থেকেই দেখা যায় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা বাঙালিকে আপন করে নিতে পারেনি। স্বাধীনতা ও মুক্তির বদলে বাঙালিরা পেল বৈষম্যমূলক আচরণ। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যকার সম্পর্ক হয়ে যায় শোষণ ও শোষিতের। আমরা হলাম শোষিত শ্রেণির। রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের মাঝে ব্যাপক বৈষম্যের মাধ্যমে বাঙালিদের দমিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বাঙালিরা বিভিন্নভাবে এই শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। সবশেষে মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে বাঙালি নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে।

## রাজনৈতিক বৈষম্য

হাজার মাইলের ব্যবধানে গড়ে ওঠা পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে গুরুত্বের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালিরা বৈষম্যের স্বীকার হয়। পাকিস্তানের জনসংখ্যার বড় অংশ বাঙালি হলেও ঢাকাকে রাজধানী না করে করাচিকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজধানী করা হয়। রাষ্ট্রের বড় পদ গভর্নর জেনারেল, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার বেশিরভাগ সদস্য পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে নেওয়া হয়।

## সোনার বাংলা শ্মশান কেন?

বৈষম্য বিষয়	বাংলাদেশ	পশ্চিমপাকিস্তান
রাষ্ট্রপতি পদ	১৫০০ কোটি টাকা	৫০০০ কোটি টাকা
উপরাষ্ট্রপতি পদ	৩০০০ কোটি টাকা	৩০০০ কোটি টাকা
বৈদেশিক সাহায্য	মতকরা ২০ ভাগ	মতকরা ৮০ ভাগ
বৈদেশিক দ্রব্য আমদানি	মতকরা ২৫ ভাগ	মতকরা ৭৫ ভাগ
কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরী	মতকরা ১৫ জন	মতকরা ৮৫ জন
সামরিক বিভাগের চাকরী	মতকরা ১০ জন	মতকরা ৯০ জন
চাউন মণ্ড প্রতি	৫০ টাকা	২৫ টাকা
আটা মণ্ড প্রতি	৩০ টাকা	১৫ টাকা
সরকারি জৈল সেস প্রতি	৫ টাকা	২'৫০ পয়সা
স্বর্ণপ্রতি ভরি	১৭০ টাকা	১০৫ টাকা

১৯৭০ সালের নির্বাচনে ঐতিহাসিক পোস্টার। তৎকালীন আওয়ামী লীগের পক্ষে পোস্টারটি তৈরি করেন জনাব নুরুল ইসলাম এবং একেছিলেন শিল্পী হাশেম খান

## পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের পোস্টার

১৯৪৭-৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের ২১১ জনের মধ্যে বাঙালি ছিলেন মাত্র ৯৫ জন। আইয়ুব খানের আমলে ৬২ জন মন্ত্রীর মধ্যে মাত্র ২২ জন ছিলেন বাঙালি। এসব বাঙালি মন্ত্রীদের আবার গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি।

আইয়ুব খানের আমলে (১৯৫৮-৬৯) বাঙালি রাজনীতিবিদদের দমনে জেল, জরিমানা ছাড়াও বিভিন্ন আদেশ ও অধ্যাদেশের মাধ্যমে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। এমনকি ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বঙ্গবন্ধুকে প্রহসনের বিচারে ফাঁসি দেয়ার জন্য তাঁকেসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা (রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য) দায়ের করে সরকার। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হলেও তাদের সরকার গঠন করতে দেওয়া হয় নি। পরিণতিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবি 'স্বাধীনতার দাবিতে' রূপান্তরিত হয়।

## প্রশাসনিক বৈষম্য

একটি নবীন উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে সাধারণত সরকারি চাকরিতেই বেশির ভাগ মানুষ যোগ দিতে চায়। এতে রাষ্ট্র কোনো বৈষম্য বা বাধা সৃষ্টি করলে তা মৌলিক অধিকার হরণ ও মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসাবে গণ্য হয়। সংবিধানেও প্রত্যেক নাগরিকের নিজ নিজ পেশা গ্রহণের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বাঙালিরা যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ন্যায্য পদ থেকে বঞ্চিত হতো। পশ্চিম-পাকিস্তানিরা নিজেদের লোকদের বেশি ও গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দিয়ে পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করত। পূর্ব-পাকিস্তানের জনসংখ্যা অধিক হওয়া সত্ত্বেও সরকারি পদে বেশির ভাগ ছিল পশ্চিম-পাকিস্তানি। গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় যেমন প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বড় পদে বাঙালিদের নেওয়া হতো না। এক্ষেত্রে পাকিস্তানের প্রথম শ্রেণির পদে মাত্র ২৩ ভাগ বাঙালি অফিসার ছিলেন। তাছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক, রেলওয়ে, কর্পোরেশনসহ সরকার নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন কার্যালয়ে বাঙালিদের নিয়োগে একইভাবে বৈষম্য করা হতো।

### সামরিক ক্ষেত্রে বৈষম্য

সেনা, নৌ, বিমান বাহিনীতেও বৈষম্য ছিল। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৩টি সদর দপ্তর ও সমরাজ্য কারখানা ছিল পশ্চিম-পাকিস্তানে। সামরিক বাহিনীর অফিসার পদে মাত্র শতকরা ৫ ভাগ ছিল বাঙালি। সেনাবাহিনীতে বাঙালি ছিল মাত্র শতকরা ৪ ভাগ। নৌ ও বিমান বাহিনীতে কিছু বেশি নিয়োগ দেওয়া হলেও তা উল্লেখযোগ্য ছিল না। সামরিক বাহিনীর জন্য বাজেটের শতকরা ৬০ ভাগ বরাদ্দ হতো বার বেশির ভাগ ব্যয় করা হতো পশ্চিম-পাকিস্তানে। পদোন্নতির ক্ষেত্রেও ছিল বৈষম্য। এ কারণে আগুয়ামী লীগের ছয় দফা দাবিতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গুরুত্বসহ বিবেচিত হয়। সরকারি অবহেলার কারণে পূর্ব-পাকিস্তানের সীমান্ত অরক্ষিত থাকত। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পূর্ব-পাকিস্তানের নিরাপত্তাহীনতা প্রবলভাবে ধরা পড়ে।

### অর্থনৈতিক বৈষম্য

পাকিস্তান রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ছিল সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ সকল ব্যাংক, বিমা, বাণিজ্য ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রধান অফিস পশ্চিম-পাকিস্তানে ছিল। পূর্ব-পাকিস্তান বৈদেশিক মুদ্রা বেশি আয় করলেও শতকরা ২১ ভাগের বেশি অর্থ পূর্ব-পাকিস্তানে বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। বৈদেশিক সাহায্যের শতকরা ৩৪ ভাগ পূর্ব-পাকিস্তান পেতো। অথচ ঋণের বোঝা বাঙালিদের বহন করতে হতো। এক্ষেত্রে বিদেশ থেকে যা আমদানি করা হতো তার মাত্র ৩১ শতাংশ পূর্ব-পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ ছিল। পূর্ব-পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য কম অর্থ বরাদ্দ হওয়ায় এখানে উন্নয়ন তেমন হয়নি। অথচ আমাদের টাকায় পশ্চিম-পাকিস্তানকে উন্নত করে গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া পূর্ব-পাকিস্তান থেকে পশ্চিম-পাকিস্তানে প্রচুর সম্পদ পাচার হতো। রঙানি আয়ের ২০০০ মিলিয়ন ডলার পাকিস্তান আমলে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে

পশ্চিম-পাকিস্তানে পাচার হয়েছিল। এই বৈষম্য বোঝানোর জন্যে সে সময়ে ব্যবহৃত একটি প্রতীকী পোস্টার উপস্থাপন করা হলো।

গরুটি পূর্ব-পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) ঘাস খাচ্ছে আর দুধ দোহন করে নিয়ে যাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানিরা। অর্থাৎ উৎপাদন হয় পূর্ব-পাকিস্তানে আর অর্থ চলে যায় পশ্চিম-পাকিস্তানে।



অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রতীকী চিত্র

### সাংস্কৃতিক বৈষম্য

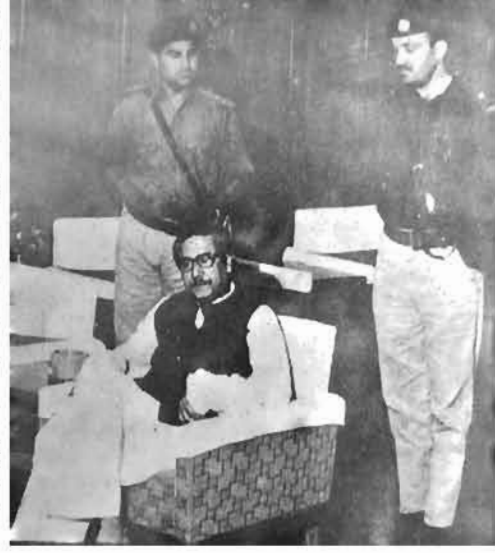
পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ধ্বংস করতে পাকিস্তানি শাসকরা তৎপর হয়ে উঠে। ১৯৪৮ সালে জোরপূর্বক উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাঙালিকে জীবন দিতে হয়। ১৯৫৬ সালে সংবিধানে বাংলাকে পাকিস্তানের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হলেও বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে চক্রান্ত থেমে থাকে নি। এ সময় পূর্ব-বাংলার নাম পূর্ব-পাকিস্তান করা হয়। উর্দু হরফে বাংলা লেখার চেষ্টা অব্যাহত থাকে। চলচ্চিত্র, নাটক, পত্রিকা, বই প্রকাশে সীমাহীন নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও রেডিও-টিভিতে রবীন্দ্রসংগীত সম্প্রচার বন্ধ এবং বাংলা নববর্ষ উদযাপন নিষিদ্ধ করা হয়। এভাবে বাঙালির সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বিভিন্নভাবে আঘাত হানা হয়।

### বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

বাঙালি লড়াকু জাতি। মুঘল, ব্রিটিশ আমলে বাঙালি অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে। পাকিস্তান সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণও বাঙালি জাতি কখনো মুখ বুজে সহ্য করেনি। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালির পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনের সূচনা করে। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট মুসলিম লীগকে পরাজিত করে। এতে বাঙালি প্রথমবারের মতো স্বল্প সময়ের জন্য সরকার গঠনের সুযোগ পায়। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্ররা শিক্ষা-আন্দোলনের মাধ্যমে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। ষাটের দশকে সাহিত্য সম্মেলন, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে আইয়ুব বিরোধী তৎপরতা চালানো হয়। ১৯৬১ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ সারাদেশে সাংস্কৃতিক জাগরণ ঘটে। একই বছর ‘ছায়ানট’ নামের সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হলে বাঙালির সংগীত চর্চা ও বিভিন্ন উৎসব পালনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। পুরো ষাটের দশক জুড়ে চলে সাংস্কৃতিক স্বাধিকারের আন্দোলন। ১৯৬৬ সালে ছয় দফার দাবি উত্থাপনের মাধ্যমে বৈষম্য দূরীকরণসহ বাঙালি নিজেদের দেশ চালানোর পরিকল্পনা পেশ করে। বাঙালির এই দাবি সরকার প্রত্যাখ্যান করলে শুরু হয় ছয় ও এগার দফাভিত্তিক আন্দোলন।



গণআন্দোলনের চাপে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা (রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য) প্রত্যাহার করে আইয়ুব খান পদত্যাগে বাধ্য হন। ১৯৭০ এর নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। আওয়ামী লীগের এই নিরঙ্কুশ বিজয়েই মূলত স্বাধীনতার লক্ষ্যে এগিয়ে যায় বাঙালি। পাকিস্তান ক্ষমতা হস্তান্তরে নানা ষড়যন্ত্র ও কালক্ষেপণ করতে থাকে, শুরু করে নানা টালবাহানা। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্য রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিরঙ্কুশ বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, চালায় হত্যাযজ্ঞ। পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক রাজারবাগ পুলিশ লাইনস আক্রান্ত হলে পুলিশ লাইনস বেইজ হতে আক্রমণের সংবাদ তার বার্তার মাধ্যমে সারাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করা হয় ঐ রাতেই। বঙ্গবন্ধু শ্রেফতার হওয়ার আগে ২৫শে মার্চ মধ্য রাতে অর্থাৎ ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের মাধ্যমে পাকিস্তানিদের ২৪ বছরের শোষণ আর বৈষম্যের অবসান ঘটায় বাঙালি। ফলে ৩০ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।



১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের মধ্যরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে বন্দি অবস্থায় বঙ্গবন্ধু

- কাজ- ১ : তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম-পাকিস্তানিরা যেসব ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করেছিল তার তালিকা কর।  
 কাজ- ২ : সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্যের তুলনামূলক চিত্র দেখাও।  
 কাজ- ৩ : পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত কর।  
 কাজ- ৪ : পশ্চিম-পাকিস্তানিদের নিপীড়ন ও বৈষম্যের ফলাফল কী হলো- তার ধারণা দাও।

### অনুশীলনী

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পাকিস্তান গণপরিষদে কোন সদস্য রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে প্রত্যাব উত্থাপন করেন ?  
 ক. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী      গ. ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত  
 খ. এ কে ফজলুল হক                      ঘ. মনোরঞ্জন ধর
২. পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পরেও দেশে ঐক্য প্রতিষ্ঠা না পাওয়ার কারণ-  
 i. সম্পদের সুখম বন্টন না করা  
 ii. স্বায়ত্তশাসনের দাবির প্রতি অবজ্ঞা করা  
 iii. সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ভাষাকে মর্যাদা না দেওয়া